কাশ্মীরের শাহজাদী

সায়ীদ উসমান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

কাশ্মীরের শাহজাদী

সায়ীদ উসমান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

কাশ্মীরের শাহজাদী

লেখক	সায়ীদ উসমান
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৪০০.০০ (চারশো টাকা) মাত্র

KASHMIRER SAHJADI
Writer Sayed Usman.
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 400.00, US $ 08.00 only.

ISBN : 978-984-93222-6-9
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

শায়খুল হাদীস আল্লামা উসমান গণী রহিমাহুল্লাহ-

আব্বাজান,
আমার মাথার উপর থেকে আপনার স্নেহের ছায়া
ঝরে যাওয়ার পর বুঝেছি,
পৃথিবীতে আপনার মতো আপন
আমার আর কেউ ছিল না।

আমার ভালবাসার কাশ্মীর

সেই ছোট্টবেলায়, যখন আমি হিফজখানায় পড়ি, বড় ভাইদের কাছে শুনতাম কাশ্মীরের গল্প। কাশ্মীরী ছোট্ট শিশুদের বীরত্বের গল্প, গোঁফ উঁকি দেওয়া কিশোরদের বীরত্বের গল্প, মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো যুবকদের বীরত্বের গল্প আর হযরত খাওলার মতো কাশ্মীরী বীরাঙ্গণাদের বীরত্বের গল্প। সেইসব গল্প শুনতে শুনতে আমার রক্তে যেন বান ডেকে উঠত। আমি যেন হারিয়ে যেতাম কাশ্মীরে। হয়ে উঠতাম যেন কাশ্মীরী বীরবালক।

যখন বড় হলাম, পেপার-পত্রিকায় পড়তাম আমার ভালবাসার কাশ্মীরের গল্প। কাশ্মীরীদের উপর ভারতীয় হায়নাদের নির্যাতনের গল্প। বড় ভয়ানক সেইসব গল্প। পড়ে পড়ে কাঁথায় মাথা মুড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কত কেঁদেছি! আমার ভালবাসার কাশ্মীরের জন্য আমি কত অশ্রু ঝরিয়েছি। আমার ভালবাসার কাশ্মীরের মুক্তি চেয়ে কত রাত ভোর করেছি। আহা, কাশ্মীর, আমার ভালবাসার কাশ্মীর!

আমার ভালবাসার কাশ্মীর একদিন মুক্তির স্বাদ পাবে। স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। কাশ্মীরেরও জুটবে কাঙ্ক্ষিত আযাদী, ইনশাআল্লাহ।

সায়ীদ উসমান
নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
saeedosman81@gmail.com

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this book are fictitious. No identification with actual persons (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.

কাশ্মীরের শাহজাদী

এক.

সকাল সাতটা।

লন্ডন সেন্ট্রাল কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন জাইহান কাশ্মীরী। উনিশ বছর পর বাইরের দুনিয়ার দেখা পেলেন তিনি। একবুক তাজা নিঃশ্বাস টেনে নিতে নিতে তাকালেন চারপাশে। তার চেনাজানা লন্ডন অনেক বদলে গেছে। শহরের মোড়ে মোড়ে আকাশছোঁয়া স্থাপনা। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। সবখানে গাড়িঘোড়ার আনাগোনা। মানুষের কোলাহল। লন্ডন আর উনিশ বছর আগের দেখা সেই শহরটি নেই। চারপাশের সবকিছুই কেমন যেন অচেনা।

শহরের রাস্তা ধরে এলোমেলো হাঁটতে থাকেন জাইহান। হাঁটতে হাঁটতেই একমাত্র সন্তানের কথা মনে পড়ল তার। কোথায় আছে সে? কোথায় আছে তার 'শাহজাদা মুহাম্মাদ?' বেঁচে আছে নাকি মায়ের মতো তাকেও মরতে হয়েছে? কোথায় আছে প্রিয়তমা স্ত্রীর হত্যাকারী? কোথায় আছে আশোক রায় চৌধুরী? যে তার খেয়ে, তার পরে তাকেই জেলের ভাত খাইয়েছে? বিনাদোষে জেল খাটিয়েছে? কোথায় আছে সেই পাষণ্ড?

এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন জাইহান। চমৎকার একটি মসজিদের ওপর চোখ পড়ল তার। লন্ডন ইসলামিক সেন্টার মসজিদ। হুট করেই ঢুকে পড়লেন ভেতরে। অজু করে দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন মুক্তি-আনন্দের শুকরিয়া হিসেবে। নামায শেষে কিছুক্ষণ বসে

থাকলেন। এলোমেলো অনেক চিন্তা ঘিরে ধরল তাকে। দুঃখ-কষ্ট আর ব্যথা-বেদনার স্মৃতিগুলো হাজির হলো মনে।

হঠাৎ একজন লোক এগিয়ে এলো তার দিকে। বয়স চল্লিশের কোঠায়। অভিজাত চেহারা। ছ'ফিটের মতো লম্বা। গায়ে দামি স্যুটকোট। মাথায় তুর্কি টুপি। চোখে দামি ফ্রেমের চশমা। কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, 'একটু কথা বলা যাবে?'

সালামের উত্তর দিয়ে লোকটির দিকে তাকালেন জাইহান। কাছ থেকে দেখে চেহারাটা বেশ চেনা চেনা লাগল। কিন্তু চিনতে পারলেন না। 'অবশ্যই, অবশ্যই। বসুন।'

লোকটি বসে পড়ল জাইহানের সামনে। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। 'প্রিয় ভাই' ভুল হলে মাফ করবেন, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি জাইহান কাশ্মীরী না!?'

'জি, ঠিকই চিনেছেন। আমি জাইহান কাশ্মীরী, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। অবশ্য চেহারাটা বেশ চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু পুরোপুরি চিনতে পারছি না। পরিচয়টা বলবেন?'

'আমি সাদমান হিময়ারী।' উত্তর দিল লোকটি, 'মরক্কোর জামিয়া কারউইনে 'এমবিবিএস' পড়ার সময় আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমি ছিলাম প্রথম বর্ষে। আপনি তখন শেষ বর্ষে।'

স্মৃতির পাতা উল্টাতে শুরু করলেন জাইহান। মনে পড়ে গেল সাদমানকে। তার তখন 'এমবিবিএস' শেষ হওয়ার পথে। এ সময় খবর পেলেন, আরো একজন কাশ্মীরী আছে জামিয়া কারউইনে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুঁজে বের করলেন। এরপর অবশ্য দু'জনের সম্পর্ক সিনিয়র-জুনিয়রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রূপ নিয়েছিল গভীর বন্ধুত্বে। জামিয়া কারউইনে সাদমান ছিল নতুন। পড়ালেখার নানা বিষয়ে জাইহানের সাহায্য নিয়েছে সে। তাছাড়া, পুরো জামিয়াতে ওরাই শুধু ছিল ভারতীয়। তাই দিনে দিনে ওদের সম্পর্কটা গভীর থেকে গভীর হয়েছে। কিন্তু ওখান থেকে চলে আসার পর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না সাদমানের সঙ্গে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, আপনিই তো সেই সাদমান। এ জন্যই এমন চেনা চেনা লাগছিল। চেহারাটা মনে পড়বে পড়বে করেও পড়ছিল না। এখন বেশ চিনতে পেরেছি। কেমন আছেন, কোথায়-কি করছেন এখন?'

'লন্ডন গ্রিফথ হসপিটালে আছি,' বলল সাদমান, 'সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে। আপনার খবর বলুন। ছিলেন বিখ্যাত ছাত্র। কারউইনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে 'এমবিবিএস' কমপ্লিট করেছিলেন। এখন কি করছেন, কোথায় আছেন?'

'আমার দুর্ভাগা জীবনের কথা কী বলব, জেলখানায় কেটে গেছে উনিশটি বছর।' জাইহানের মুখে দুঃখের ছায়া পড়ল।

'জেলখানায়! উনিশ বছর!' অবাক হলো সাদমান। বিস্ময় ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'কেন ভাই! কি এমন ঘটনা ঘটেছিল আপনার জীবনে, যা আপনাকে জেল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল?'

'সে এক করুণ কাহিনি। এই কাহিনি আমার জীবনের বাঁক বদলে দিয়েছিল। শুনতে চাইলে বলতে পারি। তবে কাহিনি অনেক লম্বা। বলতে সময় লাগবে। শুনতেও সময় লাগবে।'

'যত লম্বাই হোক—আমি শুনতে চাই।' আগ্রহ ফুটে ওঠে সাদমানের চোখে। তার আগে বলুন, মুক্তি পেলেন কবে?'

'আজই। আজই মুক্তি পেয়েছি জেলজীবনের কষ্ট থেকে। আর আমার এমনই সৌভাগ্য যে, মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়ে গেল আপনার মতো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে।'

'আপনার সব কাহিনি শুনব আমি। তবে এখানে নয়, আমার বাসায় গিয়ে। চলুন।' উঠে পড়লেন সাদমান। তার জোড়াজুড়িতে জাইহানও উঠতে বাধ্য হলেন। মসজিদের আঙ্গিনাতেই ছিল সাদমানের গাড়ি। গাড়িতে চড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল 'লিংকু টাওয়ারে'র সামনে।

'লিংকু টাওয়ার'টা টেমস নদীর তীরঘেঁষে গড়ে ওঠা শহর ওয়েস্টমিনস্টারের থিমস রোডের পাশে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়ে আছে। কারুকার্যখচিত গম্ভীর ডিজাইনের কারণে নান্দনিক একটা অবয়ব পেয়েছে প্রাসাদোপম টাওয়ারটি।'

'লিংক টাওয়ারে'র ষষ্ঠতলায় সাদমানের ফ্ল্যাট। জাইহানকে নিয়ে লিফটে চড়ল সাদমান। দরজার সামনে এসে কলিংবেল বাজাল। দরজা খুলে দিলো সাদমানের বড় ছেলে জিওহান। স্পষ্ট কণ্ঠে সালাম দিল সে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাদমানের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করলেন জাইহান। বিশ্রাম নিলেন কিছুক্ষণ। বিশ্রাম শেষে জাইহানের পাশে এসে বসল সাদমান। 'এবার শুরু করুন,' বলল সে, 'শোনা যাক আপনার জীবনকাহিনি!'

'আমিও বলতে চাই। তবে ধৈর্যে কুলাবে তো আপনার? দুঃখ-কষ্ট আর লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দীর্ঘ কাহিনি। অনেক সময় লাগবে বলতে।'

'তাতে কিছুই যায় আসে না।' কাঁধ ঝাকাল সাদমান। 'আমি শুনতে চাই। যত দীর্ঘই হোক সেই কাহিনি। দয়া করে শুরু করুন।'

সাদমানের জোড়াজুড়ি আর উৎসাহে নিজের জীবনের দুঃখস্মৃতির পাতা উল্টাতে শুরু করলেন জাইহান কাশ্মীরী। দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিগুলো মিছিল করে করে এসে জড়ো হতে শুরু করল তার মনে। জাইহান বলতে শুরু করলেন সেই জীবন্ত উপাখ্যান—যা তার হৃদয়ের পাতা আর বুকের খাতা রক্তমাখা অশ্রু দিয়ে রঞ্জিত করে রেখেছে গত উনিশটি বছর ধরে।

"জামিয়া কারউইন থেকে এমবিবিএস শেষ করার পর চলে এসেছিলাম লন্ডনে। লন্ডন উইলিংটন হসপিটালে এ্যাডমিশন নিয়েছিলাম 'এমডি' করতে। সেখানে পড়ার সময়ই সেবামূলক বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। পড়ালেখার পাশাপাশি রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন, রুরাল হেলথ কেয়ার ইউনিট প্রেরণ, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনা সৃষ্টির মতো বিভিন্ন কাজে দিন কেটে যেত। এভাবেই আমার সার্জারির ওপর এমডি শেষ হলো।

এরপর 'লন্ডন লাইফ হসপিটাল' নামে একটি হসপিটালের কাজে হাত দিলাম। আমার কাছে ফান্ড ছিল। দ্রুত দাঁড়িয়ে গেল হসপিটালের

কাঠামো। ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল 'অশোক রায় চৌধুরী'। গ্যাস্ট্রোলজি বিভাগের নার্স ছিল সে। একদিন সে এল আমার কাছে। বলল,

"স্যার, আমার ছোট একটি বোন আছে, 'পদ্মাবতি রায় চৌধুরী'। এ বছর 'এমবিবিএস' শেষ করেছে। এই হসপিটালে যদি ওর একটা কাজের ব্যবস্থা হয়ে যেত, খুব ভালো হতো।"

তার আগ্রহ দেখে বললাম, 'ঠিক আছে। সামনেই কয়েকজন শিক্ষানবিস মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হবে। ওকেও ইন্টারভিউ দিতে বলুন। ভালো করলে নিয়ে নেব।'

ইন্টারভিউতে বেশ ভালো করল অশোক রায়ের বোন পদ্মাবতি রায়। হসপিটালে জয়েন করল সে। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর হলো তার। ওষুধপত্র খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুদিন পর আবার জ্বর। আবার সুস্থ হলো। এরপর আবার এল জ্বর। বারবার একই অবস্থা হচ্ছিল। এ কারণে ডক্টর'স বোর্ড বসল ওকে নিয়ে। তাদের পরামর্শে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট করানো হলো। জ্বরের ক্ষেত্রে সাধারণত সেগুলো করানো হয় না। টেস্টের রিপোর্টগুলো থেকে যা বেড়িয়ে এল, সে জন্য আসলে কেউ-ই প্রস্তুত ছিল না। জানা গেল, ওর দেহে বাসা বেঁধেছে ক্যান্সার। কিন্তু সেটা সাধারণ কোনো ক্যান্সার নয়। বিরল ও আগ্রাসী প্রকৃতির ক্যান্সার– 'নিউরোব্লাস্টোমা'।

অশোক রায় ছাড়া পদ্মাবতি রায়ের মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ ছিল না। বেশ স্বচ্ছল ছিল অশোক রায় ও পদ্মাবতি। বাবার রেখে যাওয়া টিনশেড বাড়ি থেকে মোটামোটি সম্মানজনক রুপীই ভাড়া পেত তারা। যে কোনো মূল্যেই ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে প্রস্তুত ছিল পদ্মাবতি ও অশোক রায়। কিন্তু সমস্যা বাঁধল রক্ত নিয়ে। পদ্মাবতির রক্তের গ্রুপ এতটাই বিরল যে, সারা বিশ্বে অনুসন্ধান করেও ওর জন্য রক্ত পাওয়া গেল না। ওর রক্তের লোহিত কণিকায় 'ইন্ডিয়ান বি' নামের একটি 'এন্টিজেন' নেই। তাছাড়া এই রক্ত শুধু ঐ সমস্ত মানুষের কাছ থেকে পাওয়া যাবে যাদের শরীরে পজেটিভ শ্রেণির রক্ত রয়েছে। এটাও কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা হয়ে গেল যখন

জানা গেল, এ দু'টি গ্রুপের রক্ত বহনকারীদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এমন, যাদের রক্তে 'ইন্ডিয়ান বি' 'এন্টিজেন'টি আছে। অথচ দরকার হলো তাদের রক্ত, যাদের রক্তে 'ইন্ডিয়ান বি' 'এন্টিজেন'টি নেই।

'ব্রাদারব্লাড' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী রক্ত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী তার জন্য রক্তদাতা খুঁজে বেড়াল। কিন্তু পেল না। বহু মানুষ এল স্বেচ্ছায় রক্ত দেওয়ার জন্য। তাদের মধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষের রক্ত পরীক্ষা করা হলো, অথচ এমন রক্ত পাওয়াই গেল না—যাতে 'ইন্ডিয়ান বি' 'এন্টিজেন'টি নেই।

রক্ত দিতে আমাদের হসপিটালের প্রায় সবাই রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিল। কিন্তু সবার রক্তেই 'ইন্ডিয়ান বি' এন্টিজেনের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তাই কারও রক্তই গ্রহণ করা যায়নি। বাকি ছিলাম শুধু আমিই। প্যাথলজিস্টরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, আমার রক্তে 'ইন্ডিয়ান বি' 'এন্টিজেন'টি নেই! আমার রক্ত মিলে গেল পদ্মাবতি রায়ের রক্তের সঙ্গে।

সুতরাং আমি রক্ত দিতে শুরু করলাম ওকে। প্রতি চার মাস পর পর এক ব্যাগ করে রক্ত দিতে হতো। রক্ত পাওয়ার পরপরই চিকিৎসা শুরু হলো। কেমোথেরাপি দেওয়া হতে লাগল। এক বছরের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল পদ্মাবতি। আল্লাহর অশেষ দয়ায় ক্যান্সার পরাজিত হলো।

কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠার পরপরই একদম বদলে যেতে শুরু করল পদ্মাবতি। আমার প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে ইসলামের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হলো। আমার আম্মুর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলল। আম্মুর কাছ থেকে দীনি বইপত্র নিয়ে আসত। পড়ে আবার ফেরত দিত। ধীরে ধীরে আম্মুর কাছ থেকে নামাযও শিখে ফেলল। রমযানে রোযা রাখতে শুরু করল। পর্দা শুরু করল। এভাবে ভেতরে ভেতরে পুরোপুরি নিষ্ঠাবতী মুসলিম হয়ে ওঠে সে।

আমাকে একের পর এক চিঠি লিখতে শুরু করে পদ্মাবতি। চিঠিতে আমাকে বিয়ে করার আঁকুতি জানাল। যদিও সে ছিল পরমা সুন্দরী। আচার-আচরণে ভদ্র। চলাফেরায় ছিল শালীন। পর্দা শুরু করার পর সেটা আরো পূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি আমার কোনো ভাবানুরাগ ছিল না।